ISSN : 0975-8550

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক গবেষণা পত্রিকা

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। অগ্রহায়ন ১৪২১ ।। অষ্টম সংখ্যা

সূচীপত্র

তত্ত্বার্থ সূত্র : দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সূত্র পাঠভেদ ২৫৭
ড. অনুপম যশ

জৈন দার্শনিক তত্ত্বের কয়েকটি কথা ২৬২
শ্রী হরি সিংহ শ্রীমাল

প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা ২৭৪
শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক
শ্রী অনুপম যশ

।। সম্পাদক মণ্ডলী ।।

1. Dr. Satyaranjan Banerjee
2. Dr. Sagarmal Jain
3. Dr. Lata Bothra
4. Dr. Jitendra B. Shah
5. Dr. Anupam Jash
6. Dr. Abhijit Bhattacharyya
7. Dr. Peter Flugel
8. Dr. Rajiv Dugar
9. Smt. Jasmine Dudhoria
10 Smt. Pushpa Boyd

ISSN : 0975-8550

।। নিয়মাবলী ।।

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ২০.০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২০০.০০। আজীবন সদস্য ২০০০.০০ টাকা।
- শ্রমণ সংস্কৃতিমূলক এবং জৈন ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা:

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন : ২২৬৮ ২৬৫৫,
jainbhawan@rediffmail.com

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্
কোলকাতা - ৭০০ ০০৪

জৈন ভবনের পক্ষে শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পি ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্, কলকাতা -৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং জৈন ভবনে গ্রন্থনীকৃত ও অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৮১ সিমলা ষ্ট্রীট্, কোলকাতা - ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। অগ্রহায়ন ১৪২১ ।। অষ্টম সংখ্যা

তত্ত্বার্থ সূত্র : দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সূত্র পাঠভেদ

ড : অনুপম যশ

জৈন দর্শনের একটি প্রধান সূত্রগ্রন্থ হল আচার্য্য উমাস্বাতি রচিত *তত্ত্বার্থসূত্র* বা *তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র*। শ্বেতাম্বর বা দিগম্বর সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই গ্রন্থটিকে আগমতুল্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা দেন। জৈন সম্প্রদায়ের আর কোন গ্রন্থ বোধ হয় এই রূপ সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতিলাভের মর্যাদা পায় নি।

তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে গ্রন্থনাম, গ্রন্থরচয়িতার পরিচয় এবং মূল সূত্রগত পাঠ বিচারে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের অনুগামীদের মধ্যে কিছু মত পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যগুলি হল---

১. শ্বেতাম্বর মতে গ্রন্থনাম *তত্ত্বার্থ সূত্র*।
দিগম্বর মতে গ্রন্থনাম *তত্ত্বার্থ-অধিগম-সূত্র*।

২. শ্বেতাম্বর মতে গ্রন্থকার নাম আচার্য্য উমাস্বাতি।
দিগম্বর মতে গ্রন্থকার নাম আচার্য্য উমাস্বামী।

৩. শ্বেতাম্বর মতে উমাস্বামী হলেন ঘোষনন্দি ক্ষমাশ্রমনের শিষ্য।
দিগম্বর মতে উমাস্বাতি হলেন কুন্দকুন্দাচার্য্যের শিষ্য ইত্যাদি।

এই পার্থক্যগুলি ছাড়া-ও আরো অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে, বা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করা হবে। আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উপজীব্য *তত্ত্বার্থসূত্রের* দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সংস্করণের সূত্রগত পাঠভেদ। *তত্ত্বার্থসূত্রের* কোন পাঠ মূলরূপে দুই পরম্পরাতেই বিদ্যমান ছিল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। একথা

ঐতিহাসিকভাবে সিদ্ধ যে, *তত্ত্বার্থসূত্র* আগমিক কালের শেষে রচিত হয়েছিল। তাই মূল আগম গ্রন্থগুলির আধারে রচিত *তত্ত্বার্থ সূত্রের* অন্তর্গত প্রতিটি সূত্র ছিল দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় স্বীকৃত আগম গ্রন্থগুলির সারাংশ। প্রতিটি সূত্রই দিগম্বরদের স্বীকৃত মূল আগম তুল্য গ্রন্থ এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় স্বীকৃত ৪৫টি আগম গ্রন্থের বাক্যসমূহের সমর্থনের ভিত্তিতে রচিত। তাই *তত্ত্বার্থসূত্রের* প্রতিটি সূত্র শ্বেতাম্বর-দিগম্বর নির্বিশেষে সকলের দ্বারা সমানভাবে মর্যাদা প্রাপ্ত।

আগমিক যুগের খুব অল্প সময় পরেই দিগম্বর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় বিভাজন হয়েযায়। উত্তর ভারত থেকে জৈন-রা এসে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জৈন সংঘ স্থাপন করেন। পশ্চিম ভারতে মুলতা শ্বেতাম্বর গণ এবং দক্ষিণ ভারতে মূলত দিগম্বরগণ জৈন সংঘ কেন্দ্রীভূত করেনা। এই সময়েই *'তত্ত্বার্থসূত্র'* ও তার ভাষ্যের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে। জৈন ধর্ম বিভাজনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে *তত্ত্বার্থসূত্র* যেন তাদের মধ্যে একমাত্র সমন্বয় কারী সেতু হয়ে তাঁড়ায়। যা উভয় সম্প্রদায়কে সমানভাবে প্রভাবিত করে।

এই সন্ধিক্ষণে জৈন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজে এক বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে এবং তার ঝড় ঝাপটা *তত্ত্বার্থসূত্রের* উপরে-ও এসে পড়ে। ফল স্বরূপ আজকে আমরা দেখি যে তত্ত্বার্থ সূত্রের বিভিন্ন সংস্করণে (দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর) নানাবিধ পরিবর্তনের স্পর্শ। সেই পরিবর্তন সমূহকে জার্মান জৈনতত্ত্ববিৎ Suzuko Ohiro তিনভাগে ভাগ করেছেন (১) ভাষাগত পরিবর্তন, (২) প্রত্যেক অধ্যায়ে কিছু সূত্রের বিলোপ এবং (৩) সূত্রগত মত পার্থক্য। Suzuko Ohiro তাঁর *A study of Tattavarthasutra* গ্রন্থ এই তিনটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে শুধুমাত্র দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের গ্রন্থের তুলনা করে সূত্রগত পাঠভেদ নির্দেশ করা হল---

প্রথম অধ্যায়

সূত্র	তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র দিগম্বর সূত্র পাঠ	সূত্র	তত্ত্বার্থ সূত্র শ্বেতাম্বর সূত্রপাঠ
১৫.	অবগ্রহেহাবায় ধারণা।	১৪	অবগ্রহেহাপায়ধারণা :।
	x x	২১	দ্বিবিধোহবধি :।
২১.	ভবপ্রত্যয়োবধির্দেবনারকানাম্	২২.	ভবপ্রত্যয়ো নারকদেবানাম্।
২২.	ক্ষয়োপশমনিমিত্তঃ ষড়বিকল্পঃ শেষানাম্।	২৩.	যথোক্তনিমিত্তঃ .....।
২৩.	ঋজুবিপুলমতী মনঃপর্যয়ঃ	২৪	..... পর্যায় :।
২৫.	বিশুদ্ধক্ষেত্রস্বামি বিষয়ে ভ্যোহবধিমনঃ পর্যয়য়োঃ।	২৬.	বিশুদ্ধিক্ষেত্রস্বামি বিষয়েভ্যোহবধি-মনপর্যায়য়োঃ।
২৮.	তদনন্তভাগে মনঃ পর্যয়স্য।	২৯.	..... পর্যায়স্য।
৩৩.	নৈগমসংগ্রহব্যবহারর্জু সূত্রশব্দসমভিরূঢ়ৈবম্ভূতা নয়াঃ	৩৪.	..... সুত্রশব্দা নয়া :।
	x x	৩৫.	আদ্যশব্দৌ দ্বিত্রিভেদৌ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৫.	জ্ঞানাজ্ঞানদর্শনলব্ধয়শ্চতু-স্ত্রিত্রিপঞ্চভেদাঃ সম্যক্ত্ব চারিত্র সংযমাসংযমাশ্চ।	৫.	জ্ঞানাজ্ঞানদর্শনদানাদিলব্ধয়ঃ
৭.	জীব ভব্যাভব্যত্বানি চ।	৭.	জীবভব্যাভব্যত্বাদীনি চ।

	দিগম্বর সূত্র পাঠ		শ্বেতাম্বর সূত্রপাঠ
১৩.	পৃথিব্যপ্তেজোবায়ু বনস্পতয়ঃ স্থাবরা :।	১৩.	পৃথিব্যম্বুবনস্পতয়ঃ স্থাবরা :।
১৪.	দ্বীন্দ্রিয়াদয়স্ত্রসা :।	১৪.	তেজোবায়ু দ্বীন্দ্রিয়াদয়শ্চ ত্রসাঃ।
	x x	১৯.	উপযোগঃ স্পর্শাদিষু।
২০.	স্পর্শরসগন্ধবর্ণসব্দান্তদর্থাঃ।	২০.	স্পর্শরসগন্ধবর্ণশব্দাস্তেষামর্থাঃ।
২২.	বনস্পত্যন্তানামেকম্।	২৩.	বায়বন্তানামেকম্।
২৯.	একসময়াহবিগ্রহা	৩০.	একসময়াহবিগ্রহঃ
৩০.	এবং দ্বৌ ত্রীন্বাহনাহারকঃ।	৩১.	একং দ্বৌ বানাহারকঃ।
৩১.	সম্মুর্চ্ছনগর্ভোপপাদা জন্মঃ।	৩২.	সম্মুর্চ্ছনগর্ভোপপাতা জন্ম।
৩৩.	জরায়ুজাণ্ডজপোতানাং গর্ভঃ।	৩৪.	জরায়বণ্ডপোতজানাং গর্ভঃ।
৩৪.	দেবনারকানামুপপাদঃ।	৩৫.	নারকদেবানামুপপাতঃ।
৩৭.	পরং পরং সূক্ষ্মম্।	৩৮.	তেষাং পরং পরং সূক্ষ্মম্।
৪০.	অপ্রতীঘাতে	৪১.	অপ্রতিঘাতে।
৪৩.	তদাদীনি ভাজ্যানি যুগপ-দেকাস্মিত্রা চতুর্ভ্য :।	৪৪.	তদাদীনি ভাজ্যানি যুগপদেকস্যা হহ-চতুভ্য :।
৪৬.	উপপাদিক বৈক্রিয়কম	৪৭.	বৈক্রিয়মৌপপাতিকম্।
৪৮.	তৈজসমপি		x x
৪৯.	শুভং বিশুদ্ধমব্যাঘাতি চাহারকং প্রমত্তসংযতস্যৈব	৪৯.	শুভং বিশুদ্ধমব্যাঘাতি চাহারকং চর্তুর্দশাপূর্বধরসৈব।
৫২.	শেষাস্ত্রিবেদাঃ		x x
৫৩.	ঔপপাদিকচরমোত্তমদেহাঃ সংখ্যেয়বর্ষাযুষোহনপর্ত্যাযুষঃ।	৫২.	ঔপপাতিকচরমদেহোত্তম পুরুষা-সংখ্যেয় বর্ষাযুষোহন পর্বত্যায়ুষঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

১.	রত্নশর্করাবালুকাপঙ্ক ধূমতমো-মহাতমঃ প্রভাভূময়ো ধনাম্বুবা-তাকাশপ্রতিষ্ঠা : সপ্তাধোহধঃ	১. রত্নশর্করাবালুকাধূমতমোমহাতমঃ প্রভাভূময়ো চ তাম্বুবাতাকাশপ্রতিষ্ঠাঃ সপ্তাধোহয় পৃথুতরাঃ।
২.	তাসু ত্রিংশপ্তঞ্চবিংশতিপঞ্চ-দশদশাত্রি পঞ্চানেকবরকশত-সহস্রানি পঞ্চ চৈব যথাক্রমম্।	২. তাসু নরকা
৩.	নারকা নিত্যাশু ভতরলেশ্যা পরিণাদেহবেদনা বিক্রিয়াঃ	৩. নিত্যাশু ভতরলেশ্যাপরিনামদেহ বেদনাবিক্রিয়া।
৭.	জম্বূদ্বীপলবণোদাদয়ঃ শুভ নামানো দ্বীপসমুদ্রাঃ	৭. জম্বূদ্বীপলবণদয়ঃ শুভঃ নামানো দ্বীপসমুদ্রাঃ।
১০.	ভরত হৈমবতহরিবিদেহ রম্যকহৈরণ্যবত্তৈরাবতবর্ষাঃ ক্ষেত্রানিঃ।	তত্র ভরত হৈমবতহরিবিদেহরস্য-কহৈরণ্যবত্তৈরাবতবর্ষাঃ ক্ষেত্রানিঃ।

(ক্রমশঃ)

জৈন দার্শনিক তত্ত্বের কয়েকটি কথা

শ্রী হরি সিং শ্রীমাল

জৈন দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে কিছু বলব। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পৃথিবীর সর্বতই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা অনেক বেড়েছে। লোকে আর নিজ নিজ ধর্মতত্ব জেনেই সন্তুষ্ট নয়। অন্যান্য ধর্মমত সম্বন্ধেও আগ্রহশীল। জৈন তত্ব সম্বন্ধে অনেক না হলেও নানান ভাষায় কিছু কিছু বই বেরিয়েছে। বাংলা ভাষাতেও শ্রদ্ধেয় শ্রীপূরণ চাঁদ সামসুখা মহাশয়ের তিনটি বই : (১) *জৈন দর্শনের রূপরেখা,* (২) *জৈন ধর্মের পরিচয়* ও (৩) *জৈন তীর্থংকর মহাবীর* মূল্যবান অবদান। এমন অনেক সুধী জিজ্ঞাসু আছেন যাঁদের হাতে এ বইগুলো পড়েনি বা যাঁরা এই ধরণের বই নানা কারণে পড়ে উঠতে পারেন নি। তাঁদের জন্য কয়েকটি কথায় জৈন তত্ত্বের সামান্যতম পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। এইরকম বিষয় খুব সরলভাষায় বলা যায় না। তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

ঈশ্বর : ঈশ্বর বলতে সাধারণত: যা বোঝায়--সৃষ্টিকর্তা, সর্বনিয়ন্তা, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারদাতা ইত্যাদি, সেরকম কোনো ঈশ্বরের স্বীকৃত জৈন তত্ত্বে নেই। ফলত: দুটি প্রশ্ন এখানে ওঠে। (১) জৈনদের শত সহস্র মন্দির আছে। সেখানে ভগবানের মূর্তিও আছে এবং এখানে পুজাও হয়। এইসব মন্দিরে কার পুজা হয়? (২) এ জগৎ সংসার কে সৃষ্টি করেছে, কার বিধানে এটা চলছে, পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেয় কে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর শক্ত নয়। মন্দিরে মন্দিরে যে সব মূর্তি পুজিত হয় সে সব হচ্ছে জৈন তীর্থংকরদের বিগ্রহ। তীর্থংকরেরা জৈনদের বিশিষ্ট গুরু। তাঁরা অন্যান্য মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেন, নিজ সাধনা প্রভাবে সর্বকালের সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হন, যাকে 'কেবল-জ্ঞান' বলে এবং

ধর্মকে দেশ-কালের উপযোগী রূপ দেন। এই সব সময়োপযোগী ধর্মপথ প্রদর্শক গুরুদের তীর্থংকর বলে। এই রকম চব্বিশজন তীর্থংকর আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আয়ুশেষে মুক্তি বা নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

স্মৃতিপূজা : এই তীর্থংকরদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবশত: এবং ধাতে তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের বাণী আমাদের সামনে রাখতে পারি তার জন্যেই তাঁদের বিগ্রহ মন্দিরে স্থাপন। এইসব তীর্থংকরেরা সর্বকালের জন্য সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত, সংসারের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ আর নেই, কাজেই জগৎ নিয়ন্ত্রণ বা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা যদি হয়--তা হলে কে জগতের সৃষ্টি করল, কার নির্দেশে এটা চলে, কেই বা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দেয়?

আমরা ঘুরে ফিরে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এসে গেছে। আপনাদের মনে আছে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধেও দুটো প্রশ্ন করেছিলাম। এই প্রশ্নের উত্তরেই আমরা জৈন দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছাব।

শাশ্বত জগৎ : সৃষ্টিকর্তার কোন স্বীকৃতি জৈন মতে নেই, কোন জগৎ সৃষ্টির কথাই আদৌ স্বীকার করা হয় না। কাজেই সৃষ্টিকর্তার প্রশ্নই ওঠে না। এ জগৎ শাশ্বত। এ জগতের প্রতি দ্রব্য কোনরূপে অনাদিকাল বর্তমান। জগতের কোন সর্বনিয়ন্তা বিধাতার কথাও জৈন মতে বলা হয়নি। সমস্ত বিশ্বসংসার নিজের নিয়মেই চল।

এ জগৎ---জগতের প্রতিটি দ্রব্য শাশ্বত এবং জগৎ একটি নিয়মে নিজেই চলে। এই দুটি সত্যের স্বপক্ষে জৈন ছাড়াও অন্যান্য মতেও নানা যুক্তি দেখান হয়েছে এবং সেগুলি বলতে গেলে প্রায় অকাট্য।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য জীব অনেক রকম ভালমন্দ কাজকরে এবং অনেক রকম ফলভোগ করতেও তাদের দেখা যায়, অনেক সময়েই কাজের এবং ফলের কোন আপাত সম্বন্ধ দেখা যায়, অনেক

সময়েই কাজের এবং ফলের কোন আপার সম্বন্ধ দেখা যায় না, এই সব ভালমন্দ কাজ জীব কেন করে? কাজের ফল কী? কেমন করেই বা তা ফলীভূত হয়? এর উত্তরই হচ্ছে জৈন তত্বের কেন্দ্রবিন্দু যার উল্লেখ আমরা আগে করেছি।

আত্মা : প্রতিটি জীব বা আত্মা নিজ নিজ কাজের 'কর্তা' এবং কর্মফলের 'ভোক্তা'।

এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আগে এ জগৎসংসার কি নিয়ে তৈরী তা দেখে নিলে সুবিধে হবে। সমস্ত সংসার প্রধানত: দুটি দ্রব্যে বিভক্ত---'জীব' ও 'অজীব'।

জীব শাশ্বত, শুদ্ধ চৈতন্যময়, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য বা অপরিমিত আনন্দের অধিকারী। এখানে বলা দরকার যে প্রতিটি পৃথকভাবে এই সব শুণের অধিকারী, বলা যেতে পারে 'সচ্চিদানন্দময়'। যে সব আত্মা নিজ নিজ সাধনার দ্বারা নিজস্ব এই সচ্চিদানন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের বলা হয় 'মুক্ত জীব'। তাঁদের বিনাশ নেই। জন্ম, জরা, মরণ নেই। তাঁদের সুখ দু:খ নেই। তাঁরা শাশ্বত সচ্চিদানন্দরূপে সংসারের উর্দ্ধে সিদ্ধ শীলায় বর্তমান। এই অবস্থার নামই 'মোক্ষ', 'মুক্ত' বা 'নির্বাণ,' পরমকাম্য 'চরমোৎকর্ষ'।

এর অপরপক্ষে হচ্ছে 'সংসারী জীব,' যে সব জীবের এখনো মুক্তি হয়নি। এদের মধ্যে আছে দেবগতি ও নরকগতি প্রাপ্ত, জীব, মনুষ্য এবং অন্যান্য পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ, মাটি, জল, বাতাস আর অগ্নির জীব। এদের মধ্যে অনেকে কালক্রমে নিজ নিজ সাধনা প্রভাবে মুক্তিলাভ করবে, অন্যান্যরা শাশ্বতকাল সংসারচক্রে ঘুরতে থাকবে, এই সংসারগতির শেষ নেই।

অজীব: জীবের পর অজীব তত্ব। অজীব প্রধানত: পাঁচ রকম--'পূদ্গল,' 'আকাশ,' 'কাল,' 'ধর্ম', আর 'অধর্ম'। এর মধ্যে পুদ্গলটাই

আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। অন্যান্যগুলি আগে দেখে পরে সেটার আলোচনা হবে।

আকাশ : যা জীব, পুদ্‌গল আদি অন্যান্য সমস্ত জিনিষকে অবকাশ দেয় থাকবার স্থান দেয় তা আকাশ।

কাল: কাল ঠিক কোন দ্রব্য নয়। অন্যান্য দ্রব্যে সব সময় কিছু না কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, পরিবর্তনগুলি একের পর এক হয়ে যাচ্ছে। এই এই পরিবর্তনকে দ্রব্যের পর্য্যায় বলে। এই অবস্থান্তর আর তার পরম্পরা বোঝাবার জন্য কাল দ্রব্যের কল্পনা।

ধর্ম : ধর্ম জীব এবং পুদগলের গতি সহায়ক এক রকম দ্রব্য, যার অভাবে কোনরকম চলাফেরা, স্থান পরিবর্তন সম্ভব হত না, তাকে ধর্ম বা ধর্মাস্তিকায় বলে।

অধর্ম : অধর্ম বা অধর্মাস্তিকায় ধর্মের ঠিক উল্টো, যা জীব ও পুদ্‌গলকে স্থিরভাবে থাকতে সাহায্য করে।

এই দুটি পরিভাষার সঙ্গে সাধারণ অর্থে প্রচলিত ধর্ম ও অধর্ম শব্দের কোন সম্বন্ধ নেই।

পুদ্‌গল : পুদগল সেই দ্রব্য যার দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তু তৈরী (পুদগল শব্দটি একটি জৈন পরিভাষা)। পুদগল রূপী দ্রব্য এবং এর স্পর্শ, রস, ঘ্রাণও আছে। আলাদা আলাদা ভাবে পুদগল অতি সূক্ষ্ম সেইজন্যে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু পুদগলের সমষ্টি যখন বিশেষ বিশেষ পরিমাণে যুক্ত হয়ে কোন বস্তুতে পরিণত হয় তখন তা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। পুদগলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ পরমাণু নামে খ্যাত। বস্তু হিসাবে পুদগল সদা পরিবর্তনশীল কিন্তু অস্তিত্ব আদি গুণে তা শাশ্বত।

কর্ম : পুদগল আট রকমের। সবগুলো আমাদের আজকের আলোচনায় দরকারী নয়। এক মধ্যে একরকম হল *কার্মণ পুদগল।*

কার্মণ এসেছে *কর্ম* শব্দ থেকে। এই কর্ম শব্দ জৈন পরিভাষায় একটি বিশেষ মানে রাখে এবং তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আগে দেখেছি যে সচ্চিদানন্দ জীবের বা আত্মার নিজস্ব স্বভাব। তা যদি হয় তাহলে এই ভাবেই আমরা সব জীবকে দেখি না কেন? কারণ হচ্ছে এই কর্ম পুদগল বা কর্ম। এই কর্ম আমার সঙ্গে অনাদিকাল লিপ্ত থেকে আত্মার সচ্চিদানন্দ গুণ ঢেকে রেখেছে।

এই কর্ম সবচেয়ে সূক্ষ্ম একরকম পুদগল: সারা সংসারে ব্যাপ্ত। সংসারী জীবের নানা রকম কাজের জন্য, নানারকম ভাবের জন্য, নানারকম অধ্যবসায়ের জন্য, আত্মার জন্য, নানারকম ভাবের জন্য, নানারকম অধ্যসায়ের জন্য, আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়। এই গুলির প্রত্যেকের বিশেষ ফল দেবায় নিজস্ব ক্ষমতা আছে। আমরা বলতে পারি এই ফলদায়ী কর্ম পুদগলগুলি জীবির দ্বারা কৃতকার্যের জন্য আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে লিপ্ত হয় এবং যথাসময়ে ফল দিয়ে ঝরে যায়। ক্ষরিত হয়। কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে, শুভ কর্মকে পুণ্য, ফল সুখ, সাংসারিক সুখ আর অশুভ কর্ম হলে পাপ, যার ফল হল দু:খ। কর্মের হাত থেকে নিস্তার নেই। কোন কর্ম বন্ধের অব্যবস্থিত পরেও ফল দিতে পারে অথবা তিন জন্ম পর্যন্ত যে কোন সময়ে ফল দিতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে কর্মফল ভোগ তো আমরা সব সময় করছি, এই রকম ফল দিতে দিতে সমস্ত কমই তো ক্ষয় হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা হয় না। কারণ একদিকে যেমন ক্ষয় হচ্ছে আর একদিকে তেমনি আমাদের নানারকম জানিত ও অজানিত কাজের জন্য ও মনোভাবের জন্য সবসময় নতুন নতুন কর্ম বন্ধন হচ্ছে। কাজেই কোন সময়েই আত্মা কর্মযুক্ত হবে--নির্বাণ লাভ করবে। এই দুটো কাজ ঠিকভাবে কেমন করে করা যায় তারই নির্দেশ দেয় জৈন ধর্ম।

আশ্রব, বন্ধ, সংবর ও নির্জরা : কোন কিছু করার আগে আত্মার মনে কিছু অস্ফুট ভার জাগে, প্রায় মনের অজ্ঞাতেই সেই মনোভাব অনুসারে কিছু কর্ম আত্মার দিকে আকৃষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়াকে পরিভাষায় 'আশ্রব' বলা হয়। এর পর যখন মানসিক বৃত্তি স্ফুট হয় অথবা তা কোন কাজে পরিণত হয়, তখন সেই আগত কর্মগুলি আত্মার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যায়। একে বলা হয় 'বন্ধ'। যখন সাধনা ও মনোবলের দ্বারা এই বন্ধকে আটকানো হয় তখন তাকে বলি 'সংবর' এবং যখন স্বাভাবিক ফলোদয়ে তপশ্যার প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করা হয় তখন হয় 'নির্জরা'। এই রকমভাবে সকল কর্মক্ষয়ে সচ্চিদানন্দময় মুক্তি।

এরপর দুটি প্রশ্ন ওঠে, কি কারণে আশ্রব ও বন্ধ হয় এবং সংবর ও নির্জরা কেমন করে সম্ভব?

কর্মবন্ধের কারণগুলি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে-- (১) মিথ্যাত্ব, (২) অবিরতি, (৩) প্রমাদ, (৪) যোগ ও (৫) কষায়।

মিথ্যাত্ব--জগৎ এবং তার নিয়ম সম্বন্ধে প্রকৃত সত্যজ্ঞান না থাকাকে 'মিথ্যাত্ব' বলে। সাধারণ ভাবে অজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান।

অবিরতি--সংযমের অভাবকে 'অবিরতি' বলে।

প্রমাদ-- জ্ঞান, শুদ্ধাচার, কর্তব্য প্রভৃতির প্রতি তাচ্ছিল্য, তা ভুলে যাওয়া এবং তার প্রতি অবহেলা, এই হল 'প্রমাদ'।

যোগ-- মন, বচন, ও শরীরের যে কোন প্রবৃত্তিকে 'যোগ' বলে। প্রবৃত্তির ভালো, মন্দ অনুসারে শুভ কর্ম বা অশুভ কর্ম বন্ধ হয়।

কষায়-- মনের বিকৃত, দুষিত ভাবকে 'কষায়' বলে। কষায় চারটি- ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ। ক্রোধের অর্থ পরিস্কার। মান হল অভিমান, অহংকার ইত্যাদি। মায়া বলতে আমরা বুঝি ভ্রম, কপটতা ইত্যাদি। লোভের অর্থও পরিস্কার। এই চার কষায় ষড়রিপুর সঙ্গে তুলনীয়।

অষ্টকর্ম-- কর্মবন্ধের কারণ দেখা গেল এইবার কর্মের প্রকারভেদগুলি মোটামুটিভাবে দেখব। কর্মের প্রধান আটভেদ। (১) জ্ঞানাবরণীয়, (২) দর্শনাবরণী, (৩) মোহনীয়, (৪) অন্তরায়, (৫) বেদনীয়, (৬) নাম, (৭) গোত্র ও (৮) আয়ু।

জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়-- আগে বলা হয়েছে যে আত্মার নিজস্ব শাশ্বত গুণগুলির মধ্যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত দর্শন অন্যতম। যে দুটি কর্ম আত্মার এই গুণ দুইটি আবৃত করে রাখে, প্রকাশিত হতে দেয়না তাদের 'জ্ঞানাবরণীয়' ও 'দর্শনাবরণীয়' বলে।

মোহনীয়-- সাধারণ সংসারী জীবের নিজ নিজ আত্মা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই; তারা শরীরাত্মক, তারা শরীরকেই 'আমি' বলে মনে করে। 'মোহনীয়' কর্মের জন্যেই এই মোহ উৎপন্ন হয়।

অন্তরায়-- যে কর্ম জীবকে মুক্ত হয় বাধা দেয়, তার শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় অবস্থার পথে অন্তরায়, তাকেই 'অন্তরায়' কর্ম বলে। এই কর্ম অন্যান্য সৎকর্মেও জীবকে বাধা দেয়।

বেদনীয়-- সংসারী জীব সব সময় দৈহিক ও মানসিক সুখ-দু:খ, আনন্দ ও কষ্ট পায় তা হচ্ছে 'বেদনীয়' কর্মের ফল।

আয়ু-- 'আয়ুকর্ম' জন্মে জন্মে সংসারী জীবের আয়ু নির্দিষ্ট করে দেয়।

গোত্র-- সংসারী জীব আমরা দেখেছি অনেক রকম হয়। এই নানা প্রকার গতি ও উচ্চকূল ইত্যাদি নিরূপিত হয় 'গোত্র' কর্মের দ্বারা।

নাম-- আত্মার অরূপী-র গুণকে আবৃত করে তাকে নানারকম, ভালমন্দ দেহ ধারণ করায় 'নাম' কর্ম।

খুবই সংক্ষেপে কর্মের এই প্রকৃতি বিভাগ সারা হল, কিছুটা ধারণা এর থেকে হবে। কর্ম ওর তার নানারূপ প্রক্রিয়ার আলোচনা আমরা করলাম, এইবার কর্ম থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় তা দেখতে হবে।

আমরা আগে আলোচনায় দেখেছি যে কর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় সংবর আর নির্জরার সাহায্যে। আপনাদের মনে আছে যে নতুন কর্ম যাতে আত্মার সঙ্গে বন্ধ না হতে পারে তার প্রচেষ্টাই হল সংবর। কর্মবন্ধের পাঁচ কারণ বলা হয়েছে--মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, যোগ ও কথায়। এইগুলি কেমন করে আটকান যায়?

মিথ্যাত্ব আটকান যায় অজ্ঞানতা দূর করার চেষ্টায়, সত্যজ্ঞানের অনুশীলনে। সত্যজ্ঞানের অনুশীলন বিনা আর সব বৃথা। জৈনধর্মের এটা একটা খুব বড় কথা, এর আরও একটু আলোচনা আমরা পরে করব।

অবিরতি দুর হয় সংযমের অভ্যাসে। মন, বচন আর শরীর যত সংযত হয় ততই কদাগ্রহ দূর হয়, আর কদাগ্রহের সঙ্গে কর্মবন্ধের কারণও স্বভাবত:ই দূর হতে থাকে।

প্রমাদের প্রতিবন্ধক হচ্ছে সাবধানতা, নিয়মানুবর্তিতা, ধর্মে শ্রদ্ধা ও সৎকর্মে তৎপরতা, আলশ্যহীনতা।

যোগ সংবরিত হয় মন, বচন ও শরীরের অনাবশ্যক কাজগুলিকে কমিয়ে আনলে বা সেরকম কাজ বন্ধ করতে পারলে। মুক্তির জন্য বা প্রয়োজনীয় নয় তাকেই এখানে অনাবশ্যক বলি।

কষায় আত্মার সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে, প্রায় যত রকম খারাপ কাজ জীব করে, সবই ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চার রকম কষায়ের বশবর্তী হয়। এই সব দুস্কার্যের মধ্যে পাঁচটী প্রধান, সেইজন্য তাদের বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা হয়। এগুলি হচ্ছে (১) জীবহিংসা, (২) মিথ্যাবচন, (৩) চূরি, (৪) মৈথুন বা কাম প্রবৃত্তি, (৫) পরিগ্রহ বা সঞ্চয় প্রবৃত্তি।

পঞ্চব্রত: উপরোক্ত এই পাঁচ দোষের কথা সকলেই জানেন। পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই এগুলির বিশেষ উল্লেখ করা হয়। তবে জৈন ধর্মে এর

ওপর যত জোর দেওয়া হয়েছে এর যত বিস্তারিক আলোচনা হয়েছে এত বোধহয় আর কোথাও হয়নি। এই পাঁচ দোয়ের ত্যাগকে ব্রতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, সাধুদের 'পঞ্চ মহাব্রত' এবং গৃহীদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ 'পঞ্চ অণুব্রতে'। এর মধ্যে---

অহিংসা--সর্বজীবের প্রতি অহিংসাকে জৈনধর্মে একটা মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

"অহিংসা পরমো ধর্ম।"

অহিংসার অর্থ এবং প্রয়োগ খুব ব্যাপকভাবে করা হয়েছে। শরীর এবং বচনের দ্বারা জগতের প্রাণীর কিছুমাত্র ক্ষতি করা তো নয়ই এমন কি মনেও কোন জীবের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করা।

আমি মন বচন ও শরীরে কোন জীবের কোন ক্ষতি করব না এবং অন্য কেউ এই তিন রকমে হিংসায় প্রবৃত্ত হলে আমি তা কখনই অনুমোদন করব না। এই হচ্ছে জৈন অহিংসার আদর্শ।

অপরিগ্রহ--আর একটা হচ্ছে পরিগ্রহ। একে মোটামুটি সঞ্চয় প্রবৃত্তিও বলা যেতে পারে। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি ত্যাগ করে ধনসম্পদ, ভোগ-উপভোগের উপকরণ ইত্যাদি একটি সীমার মধ্যে রাখার সংকল্প ও প্রচেষ্টাকে 'অপরিগ্রহ' ব্রত বলে। এই সীমাকেও ক্রমে ক্রমে কম করে আনতে হয়, তবেই অপরিগ্রহ ব্রতের ঠিক পালন হয়।

একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে অহিংসা ও অপরিগ্রহ ব্রত পালন করলে মন শুদ্ধ হয়, শান্ত হয় কাম ক্রোধ কমে আসে। কেবল মানুষের নিজস্ব জীবনেই নয় আজ সমস্ত পৃথিবীর দিকে দেখলেও এই কথাই মনে হয় না কী, যে জাতীয় জীবনে ও সমস্ত পৃথিবীতে এই দুটি ব্রতের আজ বড়ই দরকার।

পুণ্যপাপ : সংবর সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা শেষ করার আগে পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলে নিতে চাই। পুণ্য হল শুভ কর্ম। যথা-- দয়া, পরোপকার, তীর্থদর্শনাদি আর পাপ হল অশুভ কর্ম যার ফলে সংসারে বন্ধন ও সব রকম দু:খ। জৈন তত্ত্বেব দৃষ্টিতে কিন্তু দুইই সমান, সাধনার উচ্চস্তরে দুইই ত্যাগ করতে হয়। পুণ্যের দ্বারা দেবত্ব পাওয়া যায়, মন্যুষ্য জন্মে সব রকম সুখ পাওয়া যায় কিন্তু মুক্তি পাওয়া যায় না। তবে সাধারণ ব্যবহারিক স্তরে, পুণ্য আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়, কারণ শুভ কর্ম করতে থাকলে অশুভ কাজ থেকে মন সবে আসে এবং ধর্মের দিকে মন যায়।

নির্জরা-- আশ্রবের কথা এখানে শেষ করে এবার নির্জরার আলোচনা করি। নির্জরা, আমরা জেনেছি, সঞ্চিত কর্মক্ষয়। কর্ম নিজের ফল দিয়ে স্বভাবত:ই ক্ষয় হয়ে যায়। আবার জীব নিজের চেষ্টায় অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়িও তা ক্ষয় করতে পারে। এই উপায়কেই তপ বা তপশ্যা বলা হয়। অল্প ভক্ষণ, উপবাস, শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা ইত্যাদি নানাপ্রকার শারীরিক কষ্ট নিজের চেষ্টায় গ্রহণ করাই হল তপস্যা। এই তপস্যা হওয়া উচিত নীরবে, অম্লান বদনে, মনে যেন কোন বিকার না আসে, সম্পূর্ণ নিরভিমান ভাবে এবং তা পালন করতে হয় নিজের মনের ও শরীরের শক্তি ও সামর্থ বুঝে। তা না হলে তপস্যা হবে বিকৃত, তাতে একদিকে যেমন কর্মক্ষয় হবে অন্যদিকে তেমনি তপশ্যাজনিত মনোবিকারের জন্যে নতুন কর্ম-বন্ধন হবে। সেই জন্যে তপস্যা খুব সাবধানে, নিজ নিজ অধিকার, শক্তি সামর্থ বুঝে করা উচিত।

স্বাভাবিক ভাবে যে কর্মক্ষয় হয় তার সম্বন্ধেও ধার্মিককে সচেতন, সাবধান হতে হয়। অশুভ কর্মের উদয়ে, যখন কোন কষ্ট আসে তখন তার কোন উপলক্ষ থাকে। জীব সাধারণত: এই উপলক্ষকেই তার কষ্টের জন্য দায়ী করে, ফলে তার মনে ভয়, শোক, ঈর্ষ্যা, ক্রোষ ইত্যাদি নানারকম

বিকার আসে এবং এই সব বিকারের জন্য সে নানারকম অসদাচরণ, পাপকর্ম করে, নতুন কর্ম বন্ধ করে, কর্ম তার ক্ষয় হতে হতেও হয় না। অনেক কাল বা অনন্তকাল সে সংসার চক্রে ঘুরতে থাকে। অপর পক্ষে সে যখন শুভকর্ম বা পুণ্যের প্রভাবে সাংসারিক সুখ দু:খের এই দুই অবস্থাতেই খুব সাবধান, সচেতন থাকতে হবে। কর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সব সময়ে মনে রাখতে হবে। আমিই আমার কর্মের একমাত্র কর্তা, আমিই তার ভোক্ত। জগতে কেউই আমার সুখ দু:খের জন্যে বিন্দু মাত্র দায়ী নয়। তবেই নির্জরা সম্ভব।

জ্ঞান--জৈনধর্মকে জ্ঞান মার্গ বলা হয়েছে, কারণ এই ধর্মে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিনা মুক্তি সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এতে জ্ঞান এবং আচরণ বা চারিত্র দুটোর উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। তবে এতে জ্ঞানের অর্থ যত ব্যাপক ও তার সাধনা যত সর্বাঙ্গীণ এমন আর কোথাও নেই। সেইজন্য একে জ্ঞানমার্গ বলা হয়েছে। এখানে দর্শন বিনা জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। কোন কিছু জ্ঞানমার্গ বলা হয়েছে। এখানে দর্শন বিনা জ্ঞান সম্পূর্ণ নয়। কোন কিছু জানাটাই জ্ঞান, সেটা দেখে শুনে বা পড়েন হতে পারে, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, তার অন্তর্নিহিত কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জানতে হবে, সেটাকেই বলে দর্শন।

জ্ঞান দু'রকমের, প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ। কোন কিছু শুনে বা পড়ে যে জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বা বুদ্ধির দ্বারা যে পাওয়া যায় তাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। এর অপর পক্ষে ইন্দ্রিয়, মন বা অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা না রেখে, আত্মা-প্রত্যক্ষ যে জ্ঞান, তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই হিসাবে আমাদের এবং অন্যান্য সাধারণ সংসারী জীবের যে জ্ঞান তা সবই পরোক্ষ। এবং মুক্তির পূর্বে জ্ঞানাবরণ কর্মরহিত যে সম্পূর্ণ জ্ঞান বা দর্শনের অধিকারী হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ, তাকে কেবল জ্ঞান বলে।

দর্শন--দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে বিন্দুমাত্র ভুল-ত্রুটি না হয়। দর্শনের এই পন্থা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত : 'স্যাদ্বাদ' আর 'নয়বাদ'। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ 'কোন অপেক্ষায়' বা 'কোন দৃষ্টি ভঙ্গীতে'। কোন জিনিসের কার্য কারণ সম্বন্ধ দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অনেক রকম হতে পারে। এই আপেক্ষিক সম্বন্ধগুলির আংশিক সত্যতা নির্ণয় করা ও স্বীকার করা স্যাদ্বাদের কাজ এবং এই সব আংশিক সত্যগুলিকে একে একে বিচার করা ও তার থেকে চরম নির্ণয় বের করা নয়বাদের কাজ। স্যাদ্বাদ আর নয়বাদ সম্বন্ধে অনেক বই আছে। এটা সহজে বোঝা বা দ'কথায় বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তো নয়ই। তবু এই স্যাদ্বাদ আর নয়বাদ জৈন দর্শনের বিশিষ্ট আর অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই তার উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

ত্রিরত্ন-- এই রকমে জ্ঞান, দর্শন আর চারিত্র এই ত্রিরত্নের সমন্বয়ে জৈনধর্ম। সেই কথাই বলেছেন বাচক উমাস্বাতি তাঁর জৈন সূত্র গ্রন্থ 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে'র প্রথমেই---

সম্যগ্ জ্ঞানদর্শন চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।

জৈন ধর্মের মহান অভয় বাণী উচ্চারণ করে আমার বক্তব্য শেষ করিঃ

''আমি শাশ্বত। আমার কর্মের আমিই একমাত্র কর্তা, আমিই একমাত্র ভোক্ত। আমার কর্ম ফল আমাকে ভোগ করতেই হবে। জগতের কোন শক্তি আমার কর্ম ফলের এক বিন্দু কমাতে পারে না। কেউই আমাকে কিছু দিতে পারে না, কেউই আমার কিছু নিতে পারে না। আমি আমার একমাত্র সর্বময় কর্তা। আমি শাশ্বত সচ্চিদানন্দময়।''

প্রাকৃত সাহিত্যের রূপরেখা

শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাকৃত ভাষায় যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলি নিয়েই প্রাকৃত সাহিত্য। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে যখন বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ তৎকালের প্রচলিত সাধারণের কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন, তখন থেকেই প্রাকৃত সাহিত্যের আরম্ভ বলা যায়। আসলে অশোকের অনুশাসনাবলীতে এবং অশোকের পরবর্তী কালে তাম্রপট্টে ও শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রত্নলিপিতে এবং হীনযান বৌদ্ধদের পালিতে রচিত গ্রন্থে প্রাকৃত সাহিত্যের, প্রথম প্রকাশ। এখানে পালি প্রাকৃত ভাষাই। জৈন আগম সাহিত্যে, সংস্কৃত নাটকে (সংস্কৃতাংশ বাদ দিয়ে), সেতুবন্ধ, গৌড়বহ, কুমারপাল চরিত, গাথা সপ্তশতী প্রভৃতি কাব্যে প্রাকৃত সাহিত্যের যথার্থ নিদর্শন পেয়ে থাকি। এই প্রাকৃত সাহিত্য খৃষ্ট ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দী হতে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিযোগী রূপে বিরাজমান ছিল। এখানে প্রাকৃত সাহিত্যের একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

জৈন আগম সাহিত্য

প্রাকৃত সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পাই জৈনদের ধর্মগ্রন্থে। মহাবীর মুখনিঃসৃত মধুর বাণী তাঁর শিষ্য ও গণধরগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে, এই জৈন আগম সাহিত্যের উৎপত্তি। এই জৈন সাহিত্যকে সাধারণতঃ 'সিদ্ধান্ত' বা 'আগম' বলা হয়। এর রচনা কাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতক। কারো মতে তৎপূর্বে, কারো মতে তৎপরে।

জৈনরা প্রধানত: দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত--শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। সেজন্য তাঁদের ধর্মগ্রন্থ একটু ভিন্ন প্রকারের, যদিও মূলত: উৎপত্তিস্থল এক।

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে দ্বাদশ অঙ্গ গ্রন্থ 'দৃষ্টিবাদ' লুপ্ত; আর দিগম্বরেরা বলেন, 'দৃষ্টিবাদ' তাঁদের দ্বারা রক্ষিত। এবং এই দিগম্বর সম্প্রদায়গণ কর্তৃক রক্ষিত গ্রন্থই বর্তমানে 'দিগম্বর জৈনাগম' বলে বিখ্যাত।

দিগম্বরদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' পাঁচ ভাগে বিভক্ত : (১) পরিকর্ম, (২) সূত্র, (৩) প্রথমানুযোগ, (৪) পূর্বগত এবং (৫) চূর্ণিকা। এদের মধ্যে 'পূর্বগত' বাদে অপর চারিটির বিষয় কিছু জানা যায় না। 'পূর্বগত' আবার চৌদ্দটি উপরিভাগে বিষয়ীকৃত। যথা :

(১) উৎপাত (২) অগ্রায়নীয়, (৩) বীর্যপ্রবাদ, (৪) অস্তিনাস্তিপ্রবাদ, (৫) জ্ঞানপ্রধান, (৬) সত্যপ্রবাদ, (৭) আত্মপ্রবাদ, (৮) কর্মপ্রবাদ, (৯) প্রত্যাখ্যান, (১০) বিদ্যানুবাদ (১১) কল্যাণপ্রবাদ, (১২) প্রাণবায়, (১৩) ক্রিয়া-বিশাল এবং (১৪) লোকবিন্দু-সার। অধুনা উক্ত বিষয় সমূহ যথাযথভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত না হলেও তাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নলিখিত গ্রন্থ থেকে জ্ঞানতে পারি।

ষট্‌খণ্ডাগম---পুষ্পদন্ত ভূতবলি প্রণীত 'ষট্‌খণ্ডাগম' একটি প্রাচীন দিগম্বর জৈন ধর্ম গ্রন্থ। ইহা (জৈন) শৌরসেনী ভাষায় রচিত; মধ্যে মধ্যে অর্ধমাগধী ও মাগধী ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহার রচনাকাল সম্ভবত: প্রথম বা দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি দর্শন বিষয়ক এবং কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত। যথা : জীবস্থান, স্ফুল্লকবন্ধ, বন্ধস্বামিত্ব বিষয়, বেদনা, বর্গনা ও মহাবন্ধ। পুষ্পদন্ত প্রথম ১১টি সূত্র রচনা করেন এবং তৎপরে ভূতবলি অবশিষ্টাংশ রচনা করেন। সর্বসাকুল্যে ৬০০০ সূত্র

দৃষ্ট হয়। বীরসেন কর্তৃক বিরচিত 'ধবলা' নাম্নী এর টীকা এরূপ প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থখানি 'ধবলা' নামেও বিখ্যাত।

কসায় পাহুড় (কষায় প্রাভৃত)--গুণধরাচার্য কর্তৃক বিরচিত 'কসায় পহুড়' আর একটি দিগম্বর জৈন ধর্মগ্রন্থ। ইহার রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে। এই গ্রন্থে ক্রোধাদি কষায়ের রাগদ্বেষাদিরূপে পরিণতি, তাদের প্রকৃতি, অবস্থান, অনুভাগ, প্রদেশগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'পেজ্জ দোস পাহুড়' (পেজ্জ = পেয়স, রাগ, দোষ = দ্বেষ এবং পাহুড় = প্রাভৃত)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই গ্রন্থে ক্রোধাদি চারটি বা হাস্যাদি নয়টি রাগদ্বেষাদির কথা বলা হয়েছে বলে এই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে 'পেজ্জ দোস পাহুড়'। বীরসেনাচার্য এর টীকা গ্রন্থ 'জয় ধবলা' নামেও বিখ্যাত।

মহাবন্ধ---ষট্‌খণ্ডাগমকে যে ছয় ভাগ করা হয়, তার অন্তিম ভাগের নাম 'মহাবন্ধ' এরূপ বিশাল যে কাল ক্রমে উহা ষট্‌খণ্ডাগম হতে পৃথক হয়ে যায় এবং পৃথক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়। এই অংশের টীকাও পৃথক। টীকার নাম 'মহাধবলা'। ভূতবলি আচার্য গ্রন্থের প্রণেতা। রচনাকাল আনুমানিক দ্বিতীয় শতক। গ্রন্থখানি জৈন শৌরসেনী ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জীবের বন্ধন। কিসে জীব বন্ধনদোষ হতে মুক্তি পাবে এবং কত প্রকার বন্ধন আছে ইত্যাদি বিষয়ের এতে আলোচনা আছে।

তিলোয়পণ্ণত্তি (ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি)---বৃষভাচার্য কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত 'ত্রিলোক প্রজ্ঞপ্তি' একটি প্রাচীন দিগম্বর গ্রন্থ। এতে ভূবিবরণ, বিশ্ব নির্মাণ কৌশল বিষয়ক বহু তথ্যমূলক তত্ত্ব আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে এর মধ্যে জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী, কাল নিরূপণ এবং বিভিন্ন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। জম্বূদ্বীপ, ঘাতকীখণ্ডদ্বীপ, পুষ্করদ্বীপ প্রভৃতি বহু

দ্বীপের এবং জৈন কালচক্রের বিস্তৃত বিবরণ এর মধ্যে পাওয়া যায়। এক কথায় জৈনশাস্ত্র ও তত্ত্ব উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হলে গ্রন্থখানি পাঠ করা আবশ্যক। গ্রন্থখানি মহাধিকার দ্বারা বিভক্ত এবং অতিপ্রাচীন। কারণ, 'ধবল' নামক টীকায় এর উল্লেখ আছে।

দিগম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ বিশাল। কিন্তু এ যাবৎ খুব বেশী ছাপা হয় নি। অধুনা বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি এদিকে পড়ছে।

শ্বেতাম্বর জৈনরা কিন্তু পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলিকে তাঁদের আগম গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁদের মতে 'দৃষ্টিবাদ' সম্পূর্ণ লুপ্ত এবং তার অন্তর্গত কোন গ্রন্থ বর্তমানে লভ্য নয়। সে যা হোক; দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর গ্রন্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে জৈনদের ধর্মগ্রন্থ পরস্পরের পরিপূরক ও সম্পূরক হয়েছে। সুতরাং 'দৃষ্টিবাদ' বাদে শ্বেতাম্বর জৈনদের আগম গ্রন্থ ৪৫ খানি। নিয়ে ইহাদের সংস্কৃত নাম দেওয়া হল।

(ক) একাদশ অঙ্গ : (১) আচারাঙ্গ সুত্র, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্র, (৩) স্থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়াঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী বা ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি, (৬) জ্ঞাতৃধর্মকথা, (৭) উপাসকদশা সুত্র, (৮) অন্তকৃদ্‌দশা সূত্র, (৯) অন্যুত্তরোপপাতিকদশা সূত্র, (১০) প্রশ্নব্যাকরণানি। (১১) বিপাকশ্রুত।

(খ) দ্বাদশ উপাঙ্গ সূত্র : (১২) ঔপপাতিকদশা সূত্র, (১৩) রাজপ্রশ্নীয়, (১৪) জীবাভিগম, (১৫) প্রজ্ঞাপনা সূত্র, (১৬) সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি, (১৭) জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, (১৮) চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি (১৯) নিরয়াবলী (২০) কল্পাবতংসিকা, (২১) পুষ্পিকা, (২২) পুষ্পচূলিকা, (২৩) বৃষ্ণিদশা।

(গ) দশ প্রকীর্ণ : (২৪) চতু:শরণম্, (২৫) আতুরপ্রত্যাখ্যানম্, (২৬) ভক্তপরিজ্ঞা, (২৭) সংস্তার, (২৮) তণ্ডুলবৈচালিক, (২৯)চন্দ্রবিদ্যা, (৩০) দেবেন্দ্রস্তব, (৩১) গণিতবিদ্যা, (৩২) মহাপ্রত্যাখ্যান, (৩৩) বীরস্তব।

(ঘ) ষট্ ছেদ সূত্র : (৩৪) নিশীথ, (৩৫) মহানিশীথ, (৩৬) ব্যবহার, (৩৭) আচারদশা বা দশাশ্রুতস্কন্ধ, (৩৮) বৃহৎকল্প, (৩৯) জিতকল্প বা পঞ্চকল্প।

(ঙ) মূল সূত্র : (৪০) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (৪১) আবশ্যক সূত্র, (৪২) দশবৈকালিক সূত্র (৪৩) পিণ্ডনির্যুক্তি।

(চ) চূলিকা সূত্র : (৪৪) নন্দী সূত্র, (৪৫) অনুযোগদ্বার।

এরপর আগম বহির্ভূত সাহিত্যের কথা বলছি।

(ক) নির্যুক্তি---জৈনগণ স্বীয় আগম গ্রন্থকে বোঝাবার জন্য সেই সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। সেই ব্যাখ্যা গ্রন্থই পরবর্তীকালে এক সাহিত্যে পরিণত হল। সেই জাতীয় সাহিত্যের নাম নিজ্জুত্তি (নির্যুক্তি)। বেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যেরূপ নিরুক্তের উৎপত্তি, সেরূপ জৈনাগম সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই জাতীয় নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আগম গ্রন্থের রচনাকালে বা কিছু পরেই এই নির্যুক্তি গ্রন্থের আবির্ভাব। কারণ, আগম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় দুটি নির্যুক্তি গ্রন্থের উৎপত্তি--পিণ্ড নির্যুক্তি ও ওঘ নির্যুক্তি। বর্তমানে নিম্নলিখিত আগমের নির্যুক্তি দৃষ্ট হয়; (১) আচারাঙ্গ সূত্রের, (২) সূত্রকৃতাঙ্গ সূত্রের, (৩) সূর্য প্রজ্ঞপ্তির, (৪) উত্তরাধ্যয়নের, (৫) আবশ্যক সূত্রের, (৬)দশ বৈকালিকের, (৭) দশাশ্রুত স্কন্ধের, (৮) ব্যবহার সূত্রের, (৯) ঋষিভাষিত সূত্রের।

ভদ্রবাহুকে এই জাতীয় গ্রন্থের রচয়িতা বলে ধরা হয়। নির্যুক্তি সমূহ আর্যা ছন্দে জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় রচিত। আচার্যগণ এই জাতীয় নির্যুক্তি কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে এই নির্যুক্তিই বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হয়ে

চূর্ণী ও ভাশ্য গ্রন্থে পরিণত হয় ও নতুন সাহিত্যের আকার ধারণ করে। আবার তা থেকে টীকা, বৃত্তি, অবচূর্ণি, ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। শ্বেতাম্বর জৈনাগম গ্রন্থেরই কেবল নির্যুক্তি দৃষ্ট হয়।

(খ) চূর্ণি---যেমন শ্বেতাম্বরদের নির্যুক্তি, তেমনি দিগম্বরদের চূর্ণিসূত্র। দিগম্বরেরা তাঁদের আগম গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই চূর্ণির উৎপত্তি করলেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। নির্যুক্তি হল একটি কঠিন বা পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা, আর চূর্ণি হল শব্দের এবং সূত্রের ব্যাখ্যা। নির্যুক্তি সাধারণতঃ পদ্যাত্মক, আর চূর্ণি গদ্যাত্মক। চূর্ণি-সূত্রকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে ভাষ্য, টীকা প্রভুতির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে নিম্নলিখিত চূর্ণি দৃষ্ট হয় : (১) গুণধর প্রণীত কষায়পাহুড় চূর্ণি, (২) শিববর্মার কম্মপয়ড়ী চূর্ণি (কর্মপ্রকৃতি), (৩) শিববর্মার সতক (চূর্ণি বা বন্ধশতক চূর্ণি), (৪) সিত্তরী চূর্ণি (সপ্ততিকা চূর্ণি)। ইহা ছাড়া লঘুশতক চূর্ণি এবং বৃহচ্ছতক চূর্ণিও আছে।

(গ) পট্টাবলী---পট্টাবলী বা থেরাবলী (স্থবিরাবলী) বংশ পরিচয়াত্মক সাহিত্য। অর্থাৎ জৈন ধর্মগ্রন্থে যে সমস্ত আচার্য ও তৎশিষ্য গণের নামোল্লেখ আছে, তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায় এই পট্টাবলী বা থেরাবলী সাহিত্যে। এ সাহিত্যে প্রভূত গ্রন্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে--- (১) কল্পসূত্ত থেরাবলী, (২) নন্দীসূত্র পট্টাবলী, (৩) দুসমাকাল-সমন-সঙ্ঘথয়ং, (৪) তপগচ্ছ পট্টাবলী, ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য।

প্রাকৃত রামায়ণ

যতদূর জানা যায়, প্রাকৃত কাব্য জগতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বিমল সূরি কৃত পউমচরিয়ম (পদ্মচরিত)। গ্রন্থখানি জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষায় আর্যা ছন্দে রামায়ণের বিষয় অবলম্বনে লিখিত। লেখকের মতানুসারে গ্রন্থের

রচনাকাল মহাবীরের নির্বাণ অর্থাৎ রামচন্দ্রের জীবন চরিত বর্ণনা করেছেন। লেখক বহু ব্যাপারেই বার্মীকিকে অনুসরণকরেন নি এবং সমস্ত ঘটনার মধ্যে জৈন ভাবের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থখানি পাঠে বিমল আনন্দ অনুভূত হয়।

প্রাকৃত মহাভারত

প্রাকৃত ভাষার আর একটী মহাকাব্য হচ্ছে ধবল কবি কর্তৃক বিরচিত প্রাকৃত মহাভারত হরিবংশ পুরাণ। গ্রন্থের রচনাকাল লেখকের মতে দশম বা একাদশ শতক। মহাভারতের কাহিনী সর্বাংশে অনুসৃত না হলেও লেখক এতে কৃষ্ণ ও বলরামের এবং কুরু ও পাণ্ডবদের ঘটনানিচয় সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন এবং সকলকেই, হয় জৈনধর্মে দীক্ষিত না হয় জৈন ভাবাপর করে তুলেছেন।

প্রাকৃত পুরাণ বা রচিত

যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা অনুসরণে প্রাকৃত রামায়ণ ও মহাভারত লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনি, পুরাণের পন্থা অনুসরণে প্রাকৃত পুরাণ রচিত হল। অর্থাৎ জৈন মহাপুরুষ বা তীর্থংকরদের জীবনী অবলক্ষণে এই প্রাকৃত পুরাণের সৃষ্টি হল। দিগম্বররা এই জাতীয় গ্রন্থকে 'পুরাণ' ও শ্বেতাম্বররা 'চরিত' আখ্যা দেন। এই প্রাকৃত পুরাণের রচনাকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। ত্রিষষ্টিলক্ষণমহাপুরাণ, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত তীর্থংকর মহাপুরুষদের জীবন অবলম্বনে পরবর্তীকালে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে গুণচন্দ্র গণির (১) মহাবীর চরিয়ম (১০৮২ খৃঃ), হরিভদ্রের (২) নেমিনাহ চরিউ (অপভ্রংশ, ১১৫৯ খৃঃ), মাণিকচন্দ্র ও সকলকীর্তির শান্তিনাথ চরিত, সোমপ্রভাচার্যের (৪) সুমতিনাহ চরিউ প্রাকৃত পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুষ্পদন্তের মহাপুরাণ (১০ম শকত) একখানি উৎকৃষ্ট দিগম্বর জৈন পুরাণ গ্রন্থ।

প্রাকৃত কাব্য

সংস্কৃত সাহিত্যের মত 'প্রাকৃত কাব্য'ও ভাবে-ভাষায়, ছন্দে-অলঙ্কারে ও ঘটনার পারিপাট্যে মহীয়ান্। ভাষার নিমিত্ত প্রবেশ সহজ সাধ্য নয় বলে সাধারণ পাঠক এর থেকে রস গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু যদি একবার ভাষ্য আয়ত্তীকৃত হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সংস্কৃত কাব্য থেকে এ কোন অংশে কম নহে। সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সমস্ত লক্ষণ আছে, সে সমস্ত পুংখানুপুংথ্য ভাবে হয়ত এতে সব সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু এ কাব্য নতুন ভাবে ভাবিত হয়ে এক নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। সংস্কৃত মহাকাব্যের ন্যায় কোনও এক গ্রন্থ থেকে এর ঘটনাসমূহ সচরাচর নেওয়া হয় নি, বরং অনেক কল্পনা শক্তি এ প্রাকৃত কাব্য জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। মূলকথা এই যে, প্রাকৃত কাব্যপাঠে যথার্থ আনন্দ পেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

এ ভাষায়, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, ধর্মকথাকাব্য, কথানককাব্য গদ্যকাব্য চম্পুম্পূকাব্য, ইত্যাদি বহুজাতীয় কাব্য আছে। তন্মধ্যে কয়েকটীর নামোল্লেখ করা যাচ্ছে।

মহাকাব্য---প্রবরসেনের সেতুবন্ধ, হেমচন্দ্রের কুমারপাল চরিত, সর্বসেনের হরিবিজয়, হরিভদ্রের সনৎকুমার চরিয়ম্, ধনেশ্বরের সুর-সুন্দরী চরিয়ম্, জোইন্দুর পরমপ্পয়াস, পুষ্পদন্তের নায়কুমার চরিউ, কনকামরের করকণ্ড চরিউ, হরিভদ্র সুরীর দুর্তাখ্যান, রামপানিবাদের কংসবহো, উসানিরুদ্ধম্, কুতুহলের লীলাবতী, ইত্যাদি।

খণ্ডকাব্য---হালের গাথা সপ্তশতী, জয়বল্লভের বজ্জালগ্ গং, ইত্যাদি।

কোষকাব্য---আনন্দবর্দ্ধনের বিষয়-বানলীলা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক কাব্য---বাক্পতিরাজের গউভোবহো ও মহুমবিজয়, ইত্যাদি।

ধর্মকথাকাব্য---পাদলিপ্তাচার্যের তরঙ্গবতীর ছায়াবলম্বনে লিখিত তরঙ্গ লোলা, ধনপালের ভবিস্সয়ওকহা, হরিভদ্রের সমরাইচ্চকহা, মলয়সুন্দরী কথা, ইত্যাদি।

কথানককাব্য---কালকাচার্য কথানক, কথাকোষ কথামহোদধি, কথারত্নাকর, ইত্যাদি।

গদ্যকাব্য---সোমপ্রভাচার্যের কুমারপাল প্রতিবোধ, ধনপালের ভবিস্সয়ও কথা, ইত্যাদি।

চম্পূকাব্য---যসোহরচরিয় চম্পূ, উদ্যোদনের কুবলয়মালা চম্পূ, ইত্যাদি প্রধান।

প্রাকৃত নাটক

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই বিদ্যমান। স্ত্রীলোক বাদে উচ্চশ্রেণীর পাত্রগণ সংস্কৃত বলেন, আর স্ত্রীলোক সহ নিম্নশ্রেণীর পাত্রপাত্রীগণ প্রাকৃত বলেন। কিন্তু প্রাকৃত নাটক তাদৃশ নহে। প্রাকৃত নাটকে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। এই জাতীয় নাটককে সট্টক বলে। এই নাটকে চারিটি অঙ্ক থাকে এবং তার নাম জবনিকাস্বর। বর্তমানে আমরা ছয়টী প্রাকৃত নাটকের খোঁজ পাই। যথা : (১) রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, (২) নয়চন্দ্রের রত্নামঞ্জরী, (৩) রুদ্রদাসের চন্দ্রলেখা সট্টক, (৪) মার্কণ্ডের বিলাসবতী, (৫) বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমঞ্জরী এবং (৬) ঘনশ্যামের আনন্দসুন্দরী।

প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্য

কেবল প্রাকৃত কাব্যাদি রচনা করে, প্রাকৃত সাহিত্য ক্ষান্ত হয়নি, বরং

সংস্কৃতের ন্যায়, বিজ্ঞানমূলক রচনাপদ্ধতির দ্বারা একপ্রকার প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে। এ রচনার দ্বারা প্রাকৃত সাহিত্য পুষ্ট হয়েছে।

প্রাকৃত কোষ বা অভিধান

সংস্কৃত সাহিত্যে কোষ বা অভিধান গ্রন্থ প্রচুর। প্রাকৃতে আমরা কেবল দুইটি কোষ গ্রন্থের পরিচয় পাই---একটি ধনপালের পাইয়লচ্ছিনায়মালা আর একটি হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা। এদুটি গ্রন্থেই বর্তমানে পাওয়া যায়। কিন্তু এছাড়া আরও প্রাকৃত অভিধান ছিল বলে অনুমান করতে পারি। কারণ, হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার টীকায় অনেক প্রাকৃত অভিধানকারীর নামোল্লেখ আছে।

প্রাকৃত ব্যাকরণ

ব্যাকরণ রচনায় প্রাকৃত সাহিত্যের একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়েছে। যদিও এঁরা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখতে বসেছেন, তথাপি তাঁরা সংস্কৃত ভাষার অবলম্ভন করেছেন। কচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ যেরূপ পালি ভাষায় রচিত, এ প্রাকৃত ব্যাকরণ তাদৃশ নহে। সূত্র রচনায় এঁরা সংস্কৃতের পন্থাই অনুসরণ করেছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে : (১) বররুচির প্রাকৃত প্রকাশ, (২) চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণ, (৩) হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৪) ত্রিবিক্রমের প্রাকৃত ব্যাকরণ, (৫) ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, (৬) লক্ষ্মীধরের ষড়, ভাষাচন্দ্রিকা, (৭) সিংহরাজের প্রাকৃত রূপাবতার, (৮) মার্কণ্ডয়ের প্রাকৃত সর্বস্ব, (৯) শ্রুতসাগরের ঔদার্য চিন্তামণি, (১০) রামশর্মা তর্কাবাগীশের প্রাকৃত কল্পতরু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত ব্যাকরণে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভ্রংশ, প্রাচ্যা, আবন্তী, চাণ্ডালী, শাবরী, টাক্কী, নাগর, বাচড় প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার লক্ষণাদি লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাকৃত ছন্তঃশাস্ত্র

প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ প্রভূত রচিত না হলেও, এর ছন্দোরাশি বিশাল। বিশেষ করে নব্যভারতীয় ছন্দের উৎপত্তির ব্যাপারে এর দান অনেক। পিঙ্গলাচার্যের প্রাকৃত পিঙ্গল অপভ্রংশ ভাষায় রচিত একখানি প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। এতে মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত উভয় জাতীয় ছন্দই বিদ্যমান। গাহ্য, বিগ্‌গাহ্য, রোলা, দোহা, ঘত্তা, কব্বলক্‌খণ মল্লিকা, চচ্চরী প্রভূতি ছন্দবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ছন্দানুশাসনম্ আর একটি বিশাল প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ। কবিদর্পণও প্রাকৃত ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট ছন্দোগ্রন্থ।

প্রাকৃত ভাষায় দর্শন

জনগণ প্রাকৃত ভাষায় স্বীয় ধর্মের দর্শন লিখতে আরম্ভ করলেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে উপনিষদের সারগর্তবাণী যখন বৌদ্ধদের মধ্যে অনাস্থা স্থাপন করল তখন সৃষ্ট হল বৌদ্ধদের শূন্যবাদ বা 'শান্তিবাদ'। কিন্তু এদেও শেষ হয় নি। জৈনগণ 'অস্তি' ও 'নাস্তি'র মধ্যে আর একটা নতুন দর্শনের সৃষ্টি করলেন, যাকে বলা হল 'শ্যাদ্বাদ'। এ দর্শন উভয় দর্শনের মধ্যগা পন্থা অবলম্বন করল। এ দর্শনকেই ভিত্তি করে, জৈনগণ ন্যায়, তর্কশাস্ত্র, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। আবশ্যক নিয়ুর্কিতে পাওয়া যায় ভদ্রবাহু দর্শবিভাগে বিভক্ত করে ন্যায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। এবং সূত্র কৃতাঙ্গ নির্যুক্তিতে পাওয়া যায়, ভদ্রবাহু স্বয়ং 'শ্যাদ্বাদ' শিক্ষা দিয়ে লোকের মন জয় করেছিলেন। জৈনদর্শনে পদার্থ (দ্রব্য), পদার্থজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে লোকের মন জয় করেছিলেন। জৈনদর্শনে পদার্থ (দ্রব্য), পদার্থজ্ঞান, কালচক্র, কালতত্ব, সৃষ্টি প্রকরণ, আত্মা ও দেহ, ইন্দ্রিয়বর্গ প্রভৃতির অপূর্ব ব্যাখ্যা আছে। এই ব্যাখ্যায় জৈন মণিধীরা তাঁদের প্রজ্ঞাশক্তির অপূর্ব পরিচয় ছিয়েছেন। এ মণিষীদের মধ্যে কুন্দকুন্দাচার্য বা এলাচার্য প্রধান। তিনি প্রাকৃত ভাষায়

৮৩টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তন্মধ্যে (১) পঞ্চাস্তিকায়, (২) প্রবচনসার, (৩) সময়সার, (৪) নিয়মসার, (৫) ষট্প্রাভৃত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে ভট্টক স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিলেন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত মূলাচার ও ত্রিবার্ণাচার গ্রন্থে। কার্তিকেয় স্বামীর কার্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা উমাস্বামীনের তত্ত্বার্থধিগমসুত্র, হরিভদ্রের দ্রব্যগুণ, শ্রাবক প্রজ্ঞপ্তি, প্রশমরতি প্রকরণ প্রভৃতি দর্শন উল্লেখযোগ্য।

এভাবে জৈনরা প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রে, অর্থশাস্ত্রে, কামশাস্ত্রে এবং গণিতে, জ্যোতিষে, এমনকি আয়ুর্বেদ, ভূগোল ইতিহাসে, সৃষ্টি প্রকরণে বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করে প্রাকৃত সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন।

(জৈন দর্শন ও সংস্কৃতি পরিষদের সৌজন্যে)

প্রাপ্ত

জৈন ভবন প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

পি - ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০০৭

বাংলায় ঃ

১।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত	মূল্য	৪০.০০
২।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	মূল্য	২০.০০
৩।	পুরণচাঁদ শ্যামসুখা – ভগবান্ মহাবীর ও জৈনধর্ম	মূল্য	১৫.০০
৪।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম	মূল্য	২০.০০
৫।	শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়– মহাবীর বচনামৃত	মূল্য	২০.০০
৬।	শ্রী জগৎরাম ভট্টাচার্য – দশবৈকালিকসূত্র (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	২০.০০
৭।	ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য – আত্মজয়ী	মূল্য	৩০.০০

ইংরাজীতে ঃ

৮।	Bhagavatî sûtra- Text with English translation- in 4 volms by K.C. Lalwani প্রতি খণ্ড	মূল্য	১৫০.০০
৯।	James Burges-The Temples of Satrunjaya.	মূল্য	১০০.০০
১০।	P.C. Samsukha-Essence of Jainism	মূল্য	১৫.০০
১১।	Ganesh Lalwani-Thus Sayeth Our Lord.	মূল্য	৫০.০০
১২।	Lalwani and Banerjee-Weber's Sacred Literature of the Jains	মূল্য	১০০.০০
১৩।	Satya Ranjan Banerjee - Introducing Jainism	মূল্য	৩০.০০
১৪।	Satya Ranjan Banerjee - Jainism in Different States of India.	মূল্য	১০০.০০

হিন্দীতে ঃ

১৫।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত (২য় সংস্করণ) (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৪০.০০
১৬।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতি কী কবিতা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	২০.০০
১৭।	গণেশ লালওয়ানী – নীলাঞ্জনা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৩০.০০
১৮।	গণেশ লালওয়ানী – চন্দন মূর্তি (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৫০.০০
১৯।	গণেশ লালওয়ানী – বর্ধমান মহাবীর	মূল্য	৬০.০০
২০।	গণেশ লালওয়ানী – পঞ্চদশী	মূল্য	১০০.০০
২১।	গণেশ লালওয়ানী – বরসাৎ কী এক রাত	মূল্য	৪৫.০০
২২।	শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী –ইয়াদোঁ কে আঈনে মেঁ	মূল্য	৩০.০০
২৩।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা	মূল্য	২০.০০

এ ছাড়া জৈন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তিনটি পত্রিকা

ইংরেজীতে ত্রৈমাসিক জৈন জার্নাল	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 0021 - 4043	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০
বাংলায় মাসিক শ্রমণ	বার্ষিক	২০০.০০
ISSN : 0975 - 8550	(আজীবন সদস্য)	২০০০.০০
হিন্দীতে মাসিক তিখয়র	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 2277 - 7865	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০